আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
বাঙালির মস্তিষ্ক ও
তাহার অপব্যবহার
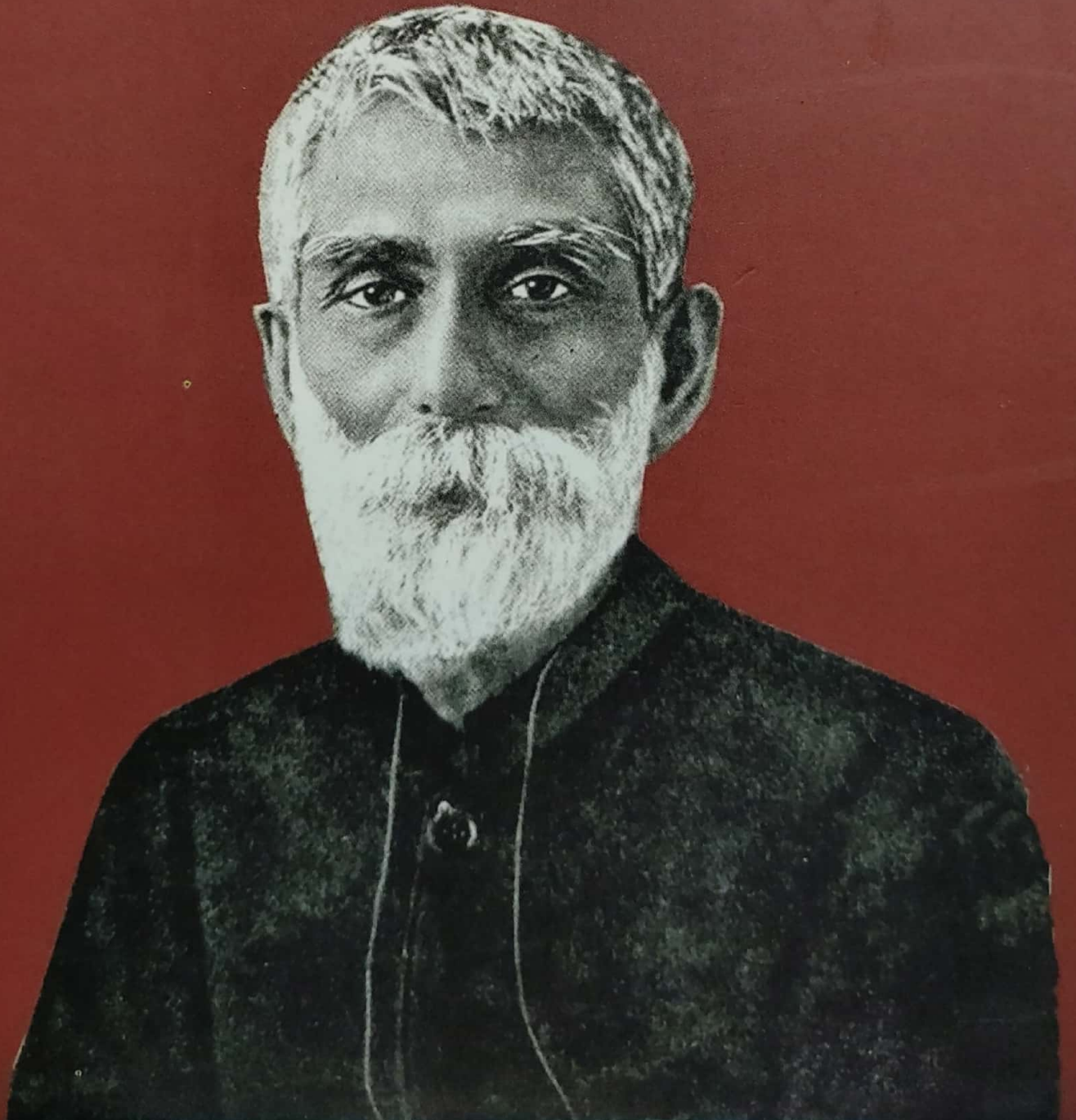
বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

পাতাবাহার

সম্পাদকীয়

জন্মসার্ধশতবর্ষের দৌলতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে বিজ্ঞানাচার্যের কৌলিন্য আদায় করে নিলেও তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার দিকটি আজও আমাদের কাছে অনেকটাই অবহেলিত। যদিও বহুবার তিনি শ্রীমুখে বলেছিলেন, 'আমি রসায়নবিদ হয়েছি নেহাতই ভুলবশত। আমার অনুরাগ ছিল ইতিহাস, জীবনী সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্যে।' ভাবতে অবাক লাগলেও সত্যি যে রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালির সাহিত্যচর্চার অতি সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন নেহাত এক-আধবার নয়, সব মিলিয়ে ন' বার (বাংলা ১৩০৮, ১৩১০, ১৩১৬-১৭, ১৩২৭, ১৩৩৪-৩৭ সালে)। মায় একটানা চার বছর (১৩৩৮-৪১) উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতির গুরুদায়িত্বও সামলেছেন। সুতরাং বিজ্ঞানাচার্যের সাহিত্যানুরাগকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাহিত্যসত্তার প্রথম সোপান হিসেবে 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' নামক স্বল্প-আয়তন গ্রন্থটিকে চিহ্নিত করতে বাধা নেই। সমকালে গ্রন্থটি যে বঙ্গমানসে বেশ কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল গ্রন্থপ্রকাশের এক দশকের মধ্যেই তিন তিনটি সংস্করণই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তবে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ সম্পর্কিত কিছুটা ধোঁয়াশা থাকছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় (২৩ খণ্ড, ১৬৭ সংখ্যক) অজয়কুমার নন্দী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যে নাতিদীর্ঘ জীবনী লিখেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯১০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাহিত্য পরিষদে এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির যে একটিমাত্র শতছিদ্র কপি রয়েছে, সেটি তৃতীয় সংস্করণের। তৃতীয় সংস্করণটি সাহিত্য পরিষৎ থেকে নয়, প্রকাশিত হয়েছে

চক্রবর্তী চ্যাটার্জি কোম্পানি (ঠিকানা— ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা) থেকে। আখ্যাপত্রে দেখা যাচ্ছে এই সংস্করণটি ৩০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছে। ছাপা হয়েছে ৯০, মানিকতলা মেন রোডস্থিত বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টিম প্রেসে। গ্রন্থটির মূল্য ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল এক আনা। পরে তা কেটে হাতে লেখা হয়েছে ছয় পয়সা। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে প্রকাশের সাল তারিখের কোনো উল্লেখ নেই। আখ্যাপত্র ইত্যাদি বাদে গ্রন্থটির মূল পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৯। লেখকের নাম ছিল শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। বর্তমান পাতাবাহার সংস্করণটি এই তৃতীয় সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত। কেবল বানান আধুনিক করা হয়েছে।

এদিকে ড: বিমলেন্দু মিত্র তাঁর 'রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ১৯১০ সালে সুপ্রভাত পত্রিকায় 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' নামক প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশ পায়। এবং ওই বছরই সিটি বুক সোসাইটি এর ইংরেজি অনুবাদ 'Bengali Brain and its Misuse' নামে ৫০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। কুমুদিনী মিত্র (বসু) সম্পাদিত সুপ্রভাত পত্রিকার ১৯১০ সালের (বাংলা ১৩১৬-১৭) কপি অতি দুষ্প্রাপ্যতার কারণে আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণের এক জায়গায় কথা প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে, ১৯০৯ সালে তিনি এই প্রবন্ধটি লেখেন। এবং তাঁর সেই কথার সূত্রেই অনুমান করা যায় ১৯২০ সাল নাগাদ চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড কোং থেকে এই তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।

যাই হোক, এই নিয়ে সামান্য বিতর্কের অবকাশ থাকলেও 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' গ্রন্থটিই যে কর্মবিমুখ, অলস, চাকরি-প্রিয়, হীনমন্যতায় ভোগা বাঙালিকে নিয়ে দূরদর্শী প্রফুল্লচন্দ্রের আদিতম গ্রন্থ তাতে সন্দেহ নেই। কারণ দেখা যাচ্ছে এরপর ১৯২০ সাল থেকে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এ-সংক্রান্ত একের পর এক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। যেমন 'অন্নসমস্যা ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা' (মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩২৯), 'বাঙালি কোথায় গেল?' (প্রবাসী, ১৩৩৯), 'বাঙালি কোথায়?' (আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, ১৩৩৯), 'বাঙালির শক্তিসামর্থের অপব্যবহার ও বর্তমান সমস্যা' (মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩১), 'কৃষি, ব্যবসা ও বাঙালি যুবকের অন্নসমস্যা'

(ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৩৫), 'শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙালির অন্নসমস্যায় পরাজয়' (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০), 'বাঙালি তুমি কি ধ্বংসসাগরে ঝাঁপ দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ' (ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৪৪)— এমনই সব অজস্র প্রবন্ধ। এই নিয়ে আরও কিছু গ্রন্থও লিখেছেন তিনি।

বাঙালির মস্তিষ্কের উৎকর্ষতার প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শ্রদ্ধার কোনো খামতি ছিল না। কিন্তু তার মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহার যে 'শীর্ণ দেহ, রক্তহীন বিবর্ণ, জ্যোতিহীন চক্ষু, অনাহার-ক্লিষ্ট, অসহায়, নৈরাশ্যপীড়িত, মানসিক অবসাদগ্রস্ত' বাঙালি জাতির সৃষ্টি করেছিল তা তাঁর কাছে যথেষ্ট শিরপীড়ার কারণ হয়। নিজের জীবনচরিত 'আত্মচরিত'-এ তাই তিনি লিখেছেন, 'আমি বাঙালি চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দোষ-ত্রুটি দেখাইতে দ্বিধা করি নাই। অস্ত্রচিকিৎসকের মতই আমি তাহার দেহে ছুরি চালাইয়াছি এবং ব্যাধিগ্রস্ত অংশ দূর করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বাঙালি আমারই স্বজাতি এবং তাহাদের দোষ-ত্রুটির আমিও অংশভাগী। তাহাদের যেসব গুণ আছে, তাহার জন্যও আমি গর্বিত, সুতরাং বাঙালিদের দোষ-কীর্তন করিবার অধিকার আমার আছে।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজে ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। তাই বাঙালির ব্যবসা-বিমুখতা তাঁকে আদৌ খুশি করতে পারেনি। আলোচ্য গ্রন্থে এই নিয়ে তাঁর মনোবেদনা সুপরিস্ফুট। জীবনের যাবতীয় সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৪০ সালের ৮ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা স্টেশন থেকে প্রচারিত বেতার-বার্তায় বাঙালির অধঃপতনের কথা তুলে ধরেছিলেন তিনি— 'সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে বাংলার যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে আজ তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন বাঙালির ছিল গোলাভরা ধান, দেহ-জোড়া স্বাস্থ্য, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ। কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত সব ছিল বাঙালি। গেরস্ত ঘরে ঝি চাকর সবই ছিল বাংলা দেশের লোক। জাতিগত বৃত্তি মেনে তারা সুখে না হলেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। গ্রামে-গ্রামে ছোট-খাট মুদির দোকান ছিল তিলি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া। একেবারে আলাদা মণিহারি দোকানেরও সৃষ্টি তখন হয়নি। সত্যি কথা বলতে কী, তখন লোকের এত মণিহারি জিনিসেরও দরকার হত না। বিলাসিতার মোহ পঁচাত্তর বছর

আগে বাংলাকে এমন করে পেয়ে বসেনি। আজকের দিনের অবস্থা বক্তৃতা করে বলার কিছু দরকার নেই। পেটে ভাত নেই, পরনে ছেঁড়া কাপড়, চোখে নিরাশা নিয়ে হাজার হাজার ছেলে 'হা চাকরি, হা চাকরি' করে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এ দেখলে কার না দুঃখ হয়!' আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'কী কুক্ষণেই না আমাদের মাথায় চাকরির নেশা ঢুকেছিল তা ভাবলে দুঃখ হয়। চাকরি পেয়ে আমরা ভাবলুম দিন এমনি করেই যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য রসাতলে দিয়ে আর একটা কাজে আমরা নিজেদের জড়িয়ে ফেললুম— সেটা হল জমিদারি। চাকরি আর জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডিগ্রির মোহ এল। চাকরি করে জমিদারি কেনা হল একটা নেশা, আর ছেলেদের ইস্কুল-কলেজে পাঠাতে আরম্ভ করা হল একটা সাধারণ নিয়ম। এমনি করে ক্রমাগত সাতপুরুষ ধরে, হয় চাকরি নয়ত জমিদারি— এই নিয়ে মেতে রইল। এখন জমিদারি গেল দেনার দায়ে— ব্যবসা গেল বুদ্ধির দোষে।'

প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং ছিলেন একাধারে সরস্বতীর বরপুত্র, অন্যদিকে লক্ষ্মীর কৃপালাভেও বঞ্চিত হননি। শিক্ষিত বাঙালির ব্যবসা সম্পর্কে যে ছুৎমার্গ রয়েছে, এই গ্রন্থে তা অপনোদনে প্রয়াসী হয়েছেন আচার্যদেব। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রবেশদ্বারস্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থটির নামোল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেছিলেন বাঙালির মানসিকতা হয়তো পাল্টাচ্ছে। 'মধ্যবিত্ত বাঙালির বেকার সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'গত ২৫-৩০ বৎসর ধরিয়া আমি দেশের সর্বত্র চিৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছি যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বাঙালি জাতি অর্থনীতিক হিসাবে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' পুস্তকে বহুদিন পূর্বে আমি যে বাঙালি জাতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, আজ বহু বিলম্ব হইলেও— সকলেই তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন।' (গৃহস্থ মঙ্গল, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১)। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার। বাঙালির বকলমে গোটা ভারতবর্ষের দুরবস্থা ও দারিদ্র-ও যে আচার্যের যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ হয়েছিল আলোচ্য গ্রন্থে সে নিদর্শনও বিরল নয়।

কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে আমরা হয়ত ব্যর্থই হয়েছি। কয়েকটি

ব্যতিক্রম বাদে আজও কি আদৌ আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির মোহ, কর্মবিমুখতা, চাকুরিপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রফুল্লচন্দ্র-বর্ণিত ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পেরেছি? আর এখানেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শতবর্ষাধিক প্রাচীন গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিকতা। একশো বছরেরও বেশি সময়ের দূরত্ব ঘুচিয়ে আচার্য-বাণী বাঙালির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তার বহু বছরের নিদ্রা ভাঙালে তাঁর সার্ধশত জন্মবর্ষে প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদিত হবে। অতিগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় গ্রন্থে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের টীকা প্রবন্ধের শেষে সম্পাদকীয় সংযোজন অংশে প্রদত্ত হল।

অর্ণব নাগ

বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার

দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে এক স্থলে বলিয়াছিলাম যে, 'প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিভব হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্বপুরুষগণের ঐশ্বর্যের দোহাই দিয়া গর্বে স্ফীত হন। আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকী বলেন যে, খৃঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপ খণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়। প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভাস্করাচার্য ভারতগগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে, আমরা নব্য স্মৃতি ও নব্য ন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙালি মস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময় স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবম বর্ষীয়া বিধবা নির্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলের উর্ধ্বতন ও অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্বিদগণ প্রাতে দুই দণ্ড দশপল গতে নৈঋত কোণে বায়স কা-কা রব করিলে সে দিন কী প্রকারে যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়পূর্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এ দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী 'তাল পড়িয়া ঢিপ করে, কি ঢিপ করিয়া তাল পড়ে' ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপে গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রমুখ মনস্বীগণ

উদীয়মান প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্বক জ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন ও মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিলেন।

উপরে যে মন্তব্য প্রকটিত হইল, তাহা একবার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে স্মরণীয় বাঙালির মধ্যে উল্লিখিত মহাত্মাগণ ও কুল্লুকভট্টের নাম করিয়া বলিয়াছেন, 'অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিণী'। এখন বিবেচনার বিষয় এই যে, আজ বর্তমান জগতের ভীষণ জীবনসংঘর্ষের দিনে আপনাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের টোলে প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরায় ন্যায় সাংখ্যের গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে, কি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে হইবে? আমরা আজ কালবারিধিতীরে দাঁড়াইয়া শুধু কি উত্তাল তরঙ্গমালা গনিয়া হতাশ মনে গৃহে ফিরিব? ক্ষুদ্র জলাশয়ে আবদ্ধ হইয়া ভাবিব, আমরা বেশ আছি? অথবা নিরাশার তীব্র দংশনের ক্ষোভ মিটাইবার নিমিত্ত ভাবিব, বর্তমান জগতের শিক্ষা ও দীক্ষা ভ্রান্তিমূলক, উহা মানব-হৃদয়ে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা জনন করিয়া সুখ, শান্তি ও আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতার পথে কণ্টকসমাকীর্ণ করে?

কোনো জাতির গৌরব ও মহত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, কী কী উপাদানে এই মহত্ব গঠিত সর্বাগ্রে তাহারই পর্যালোচনা করিতে হইবে। আমার বোধ হয়, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা বাঙালির, এমনকী হিন্দু জাতির অতীত গৌরবের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করেন মাত্র। রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের টীকা-টিপ্পনী শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিয়া, যদি উহারই আদেশ অভ্রান্ত সত্য মানিয়া, সেই অতীতপ্রায় কূটশিক্ষায় মনোনিবেশ আমাদের গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়, আর বর্তমানের নূতন আশা, নূতন উদ্দীপন ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রাচীনের প্রচলন স্থির ধীর কর্ম বলিয়া আদৃত হয়, জানি না এ মৃতপ্রায় জাতি নূতনের প্রবল অসহনীয় সংঘর্ষে আর কতদিন বাঁচিতে সক্ষম হইবে! স্বাধীন চিন্তা জাতীয় জীবননদের উৎস। এই

উৎস যেদিন হইতে শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙালি জাতির অধোগতির সূত্রপাত হইয়াছে। আজ সহস্র বৎসরকাল এই স্বাধীন চিন্তার স্রোত আলস্য এবং অন্ধবিশ্বাসরূপ গভীর কর্দমে আবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনের প্রস্রবণকে বদ্ধ করিয়াছে। যখনই স্বাধীন চিন্তা, বিচার শক্তি ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, চরিত্র মধ্যে যখন স্বীয় অভিমত পোষণ করিবার সাহস চলিয়া যায়, তখন পরের গ্রাসে আহার করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। ফলত এরূপ জীবন ইতর প্রাণীর জীবনাপেক্ষা অল্পমাত্রই বিভিন্ন, কেন না, প্রাকৃতিক আদেশ প্রতিপালনই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় নহে। একটি গাভী প্রত্যুষ হইতে প্রদোষ পর্যন্ত ঘাস খায়, ক্লান্ত হইয়া রাত্রে বিশ্রাম করে, দিবসভুক্ত নবতৃণাঙ্কুর উদ্গীরণ ও রোমন্থন করে— স্বীয় বৎসকে স্তন্য দেয় ও যথাসম্ভব তাহাকে মানুষের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পায়; পরম স্নেহাস্পদ বৎসটির গাত্র স্নেহনিদর্শনস্বরূপ অবলেহন করে। এই প্রকার জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই কি মানবের উদ্দেশ্য? আহার-বিহার-নিদ্রাই কি ঈশ্বরসৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবের কেবল একমাত্র কর্তব্য? আপনার গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া নিষ্ফল সস্বার্থ-গবেষণায় কালাতিপাত করা, জাত্যাভিমান পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া উচ্চ-নীচের কল্পিত ভেদাভেদকে গভীরতর করা, আর মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জন দিয়া, দুর্বোধ শ্রুতি ও স্মৃতির টীকাকরণে মস্তিষ্কের প্রখরতা ক্ষয় করা কি বিধাতার অভিপ্রেত? পরম করুণাময় পরমেশ্বর কি মানুষকে জ্ঞান, ধৃতি, ক্ষমা ইত্যাদি দুর্লভ গুণালংকৃত করিয়াও এতদপেক্ষা মহত্তর চরিত্র ও অনুষ্ঠান দাবি করেন না?

সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, সমগ্র ভারতবাসী অহিফেনবাসীর ন্যায় জড়, নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন যে জাতি এইপ্রকার হীনাবস্থায় পতিত হয়, তখন পুরাতনের প্রতি একটা অযথা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা স্থাপন করে, এবং আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসহীন

হয়ে পড়ে। অনন্ত পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত সামাজিক প্রথা ও ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইতেছে। কালের চঞ্চল স্রোতে, পার্থিব জগতে, যেমন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, মনোজগতেও যে তাদৃশ বিপ্লব স্বাভাবিক, ইহা অন্ধবিশ্বাসচালিত হইয়া সে জাতি বুঝিতে পারে না। তখন কী এক মোহিনী শক্তি আসিয়া হৃদয়দ্বার চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, সত্যের ও বিচারের সহস্র কুঠারাঘাতেও তাহা ভাঙে না। যখন মানবসমাজ এই প্রকার তমসাচ্ছন্ন হয়, তখন শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়— পথ দেখিবার আলোকের অভাবে ঋষিবাক্য বর্তিকাস্বরূপ গৃহীত হয়। আমাদেরও তাহাই ঘটিল। প্রত্যুষ হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দু নিজেকে এমন দৃঢ় নিগড়ে বন্ধন করিলেন যে, জীবনের যাহা কিছু কর্তব্যাকর্তব্য, স্বীয় স্বাধীনতা অম্লানবদনে বিসর্জন দিয়া, তাহা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে করিতেই হইবে ইহাই স্থির নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু কেন করিব, এ কথাটি ভুলিয়াও মনে উদয় হইল না। শাস্ত্রকারের

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।।

এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে চলিবার ইচ্ছা বা সাহস কাহারও রহিল না। সুতরাং এই দুর্দিনে দুই শ্রেণির লোকের আধিপত্য বিস্তার হইল। এক শ্রেণি শাস্ত্রকার, অপর শ্রেণি শাস্ত্রব্যাখ্যাতা। স্বাধীন চিন্তার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিকতা (Originality) চলিয়া গেল, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হইয়া ঋষিবাক্যের অর্থ লইয়া অযথা গণ্ডগোলে ব্যাপৃত হইল। ইহাই টীকা-টিপ্পনীর প্রারম্ভ। আবার শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। শ্রুতি প্রামাণ্য এই উক্তিও ওই সময়ে প্রকটিত হইল। সমাজ যখন এই অবস্থায় পতিত হয়, তখন আবার আর এক প্রকার বিপদ আসিয়া সম্মুখীন হয়। নিজের উদ্যমশীলতার ও নিজের কৃতকর্মতার উপর ঘোর অবিশ্বাস জন্মে, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ব্যাপারসমূহের উপর ততই অচল বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়ায়। 'আমি কিছুই করিতে পারি না, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না, মায়ের কাছে জোড়া মহিষ মানিব, পীর পৈগম্বরের

দরগায় সোয়া পাঁচ আনার সিন্নি দিব, আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে', ইত্যাকার বিশ্বাস আসিয়া মানবকে আশ্রয় করে। স্বাধীন চিন্তা বিসর্জনের ইহাই সর্বশেষ অধ্যায়। পীড়া হইলে ঔষধ সেবনের প্রয়োজন নাই, 'জলপড়া' পান করিলেই চলিবে, মৃতপীরের জীর্ণ বসন স্পর্শ করিলেই আরোগ্যলাভ হইবে, ইহাই তখন বিচার-শক্তির প্রাখর্য প্রমাণ করিতে থাকে। কেহ বা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঔষধ খুঁজিলেন। কোনো রমণীর উপর 'আশ্রয়' হইয়াছে ইত্যাদিবৎ দৈবঘটনার উপর তখন প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সমগ্র ইউরোপও মধ্যযুগে (Middle Ages) এই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। লেকী বলেন, চারি সহস্র ধর্ম শাস্ত্রাভিজ্ঞ (theologians) পিটর লোমবার্ড নামক এক মহাপুরুষের রচনাবলীর উপর টীকা করিয়াছেন। উক্ত ঐতিহাসিক অন্যত্র লিখিয়াছেন :

There was scarcely a town that could not show some relic that had cured the sick... The virtue of such relics radiated blessings all around them. (1, 141-42)

এই প্রকার অলৌকিক ও দৈবঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ৫৫ খণ্ড বৃহদায়তন পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহাতে বুঝিবেন যে, ইউরোপেও কুল্লুকভট্ট ও রঘুনন্দনের 'জ্ঞাতিভাই'-এর অভাব ছিল না। যে সময়ে লোকে এইপ্রকার কেবল মহাপুরুষগণের উক্তি ও তাঁহাদের টীকা-টিপ্পনী লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকে, সে সময় প্রকৃত উন্নতি ও গৌরবের সময় নহে, বরং অধোগতির প্রারম্ভ।

কিন্তু ভারতের প্রকৃত গৌরবের সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। ভারত যে শাস্ত্রবাদগ্রস্ত হইয়া চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, এমন নহে। প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি যথেষ্টই বলবতী ছিল এবং স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। এমনকী মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই; কেন না ইহা সহজে প্রমাণ হয় না। কপিল তথাপি বেদের দোহাই দিয়াছেন। যাহা হউক, ষড়দর্শন ও উপনিষদে বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র

হিন্দুজাতির মুখ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু চার্বাকমুনি শ্রুতিও অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন : 'কতিপয় প্রতারক ধূর্তেরা বেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বর্গ-নরকাদি নানাপ্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করতঃ সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং ওই সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করতঃ জনসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে এবং রাজাদিগকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থলাভ করিয়া, স্বীয় স্বীয় পরিজন প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া উত্তরকালীন লোকসকল ওই সমস্ত বেদোক্ত কার্যে অনুষ্ঠান করাতে, বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দন্তধারণ, ভস্মগুণ্ঠন এই সমস্ত বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই ওই সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কোনো ফলই দৃষ্ট হইতেছে না—এক স্থানে বিধি আছে সূর্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে কহিতেছে সূর্যোদয়ে হোম করিবেক না, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ে হোম করে, তাহার প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এইরূপে বেদে অনেক বাক্যের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় এক কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে তখন কী প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা সমস্তই মিথ্যা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্যাদির চারি আশ্রমের কর্তব্য কর্মসকল নিষ্ফল। ফলত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্মসকল অবোধ ও অক্ষম ব্যক্তিদিগের জীবনোপায় মাত্র; ধূর্তেরা কহিয়া থাকে যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে জীবের ছেদন হইয়া থাকে সে স্বর্গলোকে গমন করে। যদি ওই ধূর্তদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞেতে আপন পিতা-মাতা প্রভৃতির মস্তক ছেদন না করে কেন? তাহা হইলে পিতা-মাতা প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে এবং তাহাদিগকে আর পিতা-মাতার স্বর্গের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্টভোগ

করিতে হয় না। আর শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, কোনো ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাটীতে তাঁহার উদ্দেশে কোনো ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। অপিচ এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি না হয় কেন? যাহাতে কিঞ্চিদ্দূরস্থিতের তৃপ্তি না হয় তবে তদ্দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কী প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুত কোনো ফলোপধায়ক নহে।' (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ— জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত অনুবাদ)

সেই সময়ে স্বাধীন চিন্তা কতদূর উচ্চ শিখরে আরোহন করিয়াছিল তাহা চার্বাক-দর্শন আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। তাহার পর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভারতের সর্বত্র ঘোষিত হইল। তাহার ফলে জ্ঞানোন্নতির পথ সর্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত হওয়ায়, সর্বশাস্ত্রের সম্যক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। বিশেষত বৌদ্ধগণ রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। একা নাগার্জুনের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইনি সুশ্রুততন্ত্র পরিবর্ধিত ও নূতন আকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।[১]

বাস্তবিক সুশ্রুতে বৌদ্ধমতের ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে শবব্যবচ্ছেদের সুন্দর নিয়মাবলী ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করিবে না, এমন উপদেশ দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-প্রণেতা বাগভটও বৌদ্ধ ছিলেন; পাছে হিন্দুরা তাঁহার মত অগ্রাহ্য করেন এই বুঝিয়া এক স্থানে শ্লেষ বা ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

'যদি ঋষিপ্রণীত বলিয়াই গ্রন্থবিশেষ শ্রদ্ধেয় হয়, তবে কেবল চরক ও সুশ্রুত অধীত হয় কেন? ভেল প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় তন্ত্র একপ্রকার বর্জিত হইয়াছে কেন? অতএব কেবল গ্রন্থনিবিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই গ্রন্থের সারত্ব সম্বন্ধে বিচার হওয়া উচিত।'

পরবর্তীস্থলে আবার বলিতেছেন, 'ঔষধের গুণ লইয়াই যখন কথা, ব্রহ্মা স্বয়ং প্রয়োগ করুন বা অপর কেহ প্রয়োগ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই।'

মহাত্মা নাগার্জুন কর্তৃক এতদ্দেশে রসায়নী বিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। চক্রপাণি বলেন, তিনি যে লৌহ-রসায়ন ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা নাগার্জুন কর্তৃক প্রথম বিবৃত হইয়াছিল। রসেন্দ্রচিন্তামণিকারের মতে, তিনিই রাসায়নিক তির্যকপাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা।

প্রাচীন ভারতে কেবল যে দর্শন ও সাহিত্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এমন নহে। আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রেরও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ সমস্ত বিদ্যা কী প্রকারে লোপ পাইল? কেহ কেহ বলেন, মুসলমান আধিপত্যে রাজাগণ শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু তৎসাময়িক ইতিহাসপাঠে এই যুক্তি সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমানদিগের আর্যাবর্ত জয়ের অনেক পূর্ব হইতেই হিন্দুদিগের এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর তাহাই যদি হইত, তবে পূর্বোক্ত সমুদয় বিদ্যার আলোচনা দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কারণ তথায় মুসলমান আধিপত্য কখনও স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানদিগের শাসনকালে বাংলা দেশে, বিশেষত নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে, হিন্দু-শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা ছিল। এই উভয় স্থানই নবাবের রাজধানীর সন্নিকটে ছিল। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, উপনিষদ রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রৌঢ়াবস্থা পর্যন্ত এই সময় মধ্যে, হিন্দুর মস্তিষ্ক চালনা বা মানসিক চিন্তার যাহা যাহা কিছু গৌরব করিবার তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই সময়কে অর্থাৎ খ্রিস্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব হইতে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জ্ঞানোন্নতি বা স্বাধীন চিন্তার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সময়েই পাণিনি সাহিত্য জগতে অতুলনীয় ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতেজা ঋষিগণ ষড়দর্শন রচনা করেন এবং বুদ্ধদেব 'অহিংসা পরমধর্ম' ধ্বজা উত্তোলন করিয়া সাম্য, মৈত্রী এবং

সর্বজীবে ভ্রাতৃভাব জগতে ঘোষণা করিয়া, সমগ্র মানব-হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শ উপস্থিত করেন। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহমিহির প্রভৃতি মনস্বিগণ জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! চিরদিন কখনও সমান যায় না। উন্নতি এবং অধোগতির চক্রবৎ পরিবর্তন হইতেছে। বৌদ্ধধর্মের মহত্বের যেরূপ উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে উহার অধঃপতনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ এই সময় হিন্দু সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তারের পূর্ণমাত্রায় সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ সেই উপনিষদের ষড়দর্শনের প্রণেতা আর্যকুলগৌরব মহাতপা তেজস্বী ব্রাহ্মণ নহেন। তৎপরিবর্তে একদল অযোগ্য স্বার্থপর লোক সমাজে আবির্ভূত হইয়া, পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণের পবিত্র নামের দোহাই দিয়া, সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল এবং স্বকীয় জাতির মহিমা হারাইয়া, কেবল একগুচ্ছ শ্বেতসূত্র বা যজ্ঞোপবীতের দোহাই দিয়া, সমাজের শাসন বিষয়ক স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কেবল ব্রাহ্মণ জাতির মহিমা কীর্তন অর্থাৎ স্বার্থপর ব্রাহ্মণ নামধারী প্রভুগণের আধিপত্য বিস্তার ও জীবিকা নির্বাহ।

বস্তুত ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য কুসংস্কারের এক অতি বৃহৎ অধ্যায়। অনুসন্ধান প্রবৃত্তি একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হইল। যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক আভাস জাতীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের সহিত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, যে কিছু প্রাকৃতিক দর্শন ইত্যাদির আলোচনার আভাস সূচিত হইতেছিল, তাহা অত্যল্পকালেই বিনষ্ট হইবার পথে আসিল। এই বিলোপের কারণ শাস্ত্রকারগণের কঠোর আদেশ। মৃতদেহ স্পর্শ করিলে অশৌচ হয়, মনু এই ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন, সুতরাং শবব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান হইতে তিরোহিত হইল।[২] কেবল যদি শরীর ব্যবচ্ছেদ নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও আমরা আজ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইতাম। সমুদ্রযাত্রা পর্যন্ত ধর্ম-বিগর্হিত কার্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। হিয়ানসেং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা

যায়, তিনি যখন তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে সিংহল যাত্রা করেন এবং সিংহল হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন, তখন অনেক ব্রাহ্মণ বণিক তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। শুধু ইহাই নহে, এক সময় হিন্দুদের অর্ণবপোত অগাধ বারিধি অতিক্রম করিয়া বলি ও যাবাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল স্থানে ভগ্নাবশেষ দেবদেবীর প্রতিমূর্তি অদ্যাপিও ঐতিহাসিক অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া হিন্দুর পুরাতন কীর্তিকলাপের গাথা যেন নীরব সংগীতে গাহিতেছে। আজ যে ভারতের শিল্প পণ্য বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ বিংশ শতাব্দীর স্তরে দাঁড়াইয়াও যে ভারত প্রতীচ্য শিল্প বাণিজ্যের নিকট অবনতমস্তক, অথবা যে ভারতে বাণিজ্য কখনও সূচিত হইয়াছিল কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সেই ভারতই (বৌদ্ধ সাহিত্যপাঠে জানা যায়) Broach (বরোচ) হইতে Alexandra (আলেকসন্দ্রা) পর্যন্ত পণ্যাদি লইয়া যাইতেন। এই বাণিজ্য সংক্রান্ত আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের বিবৃত মতসকল Neo-Platonist-দের নিকট পৌঁছে। বস্তুত বাণিজ্য দ্বারা সূচিত সম্বন্ধ ক্রমেই জ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের হেতু হইয়া থাকে; পরস্পর সংযোগ হওয়াতে কেমন অজ্ঞাতভাবে জাতিগত বৈষম্য ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি শারদীয় আকাশে মেঘমালার ন্যায় অপসারিত হয়। জ্ঞানজগতেও শিশু প্রবৃত্তি বর্তমান। উহাই একটু লুক্কায়িতভাবে ক্রিয়া করে মাত্র। বালক যেমন যাহা দেখিল অমনি শিখিবার জন্য অন্তত অনুসরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, যতক্ষণ না তাহার কৌতূহল নিবৃত্তি হয়, ততক্ষণ যেমন সে পিতামাতার নিকট দৌরাত্ম্য করিতে থাকে, বয়োবৃদ্ধেরাও অল্পাধিক তাহাই করিয়া থাকেন। কোথায় কোন জাতির কী ভাল আছে, যেই সেই বিষয় শ্রুতিগোচর হইল, যখনই কোনো সত্য আবিষ্কৃত হইল, উহা কাফ্রির দ্বারাই হউক আর চীনের দ্বারাই হউক, সভ্যজগৎ উহার তাৎপর্য গ্রহণে ও আয়ত্তীকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কোথায় কোন সুদূর প্রান্তে কোন এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, কোথায় এক মহাপুরুষ নূতন ধর্মমত প্রচার করিলেন, অমনই বিদ্যুৎবেগে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপে ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মার্টিন লুথার পোপের পৌরোহিত্য

খণ্ডন করিয়া নিজের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত অভিমত Wurtemberg-এর গির্জাদ্বারে ঘোষণা করিলেন, তখনই এই সুসমাচার সমগ্র ইউরোপে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হইয়া, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। আবার গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস ও নিউটন প্রভৃতি যেমন নূতন জ্যোতিষিক তত্ত্ব প্রচার করিলেন, অচিরে উহা সমগ্র ইউরোপের সমগ্র জগতের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিদেশ ও সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়া ভারতের ভাবী উন্নতির পথ বন্ধ করিলেন। রক্ষণশীলতায়ও যে খানিকটা উপকার আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার একটা সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন হইতে নূতনতর ভাবসকল মানব মনে সমাবেশ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। কী সামাজিক, কী রাজনৈতিক, কী আধ্যাত্মিক প্রত্যেক বিভাগেই অলক্ষ্যভাবে যেন কালের পাখায় ভর করিয়া পরিবর্তন আসিয়া পৌঁছে। তখন অসাড় হইয়া থাকিলে, জগতের সংগ্রামে আহূত হইয়াও নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিলে, সে জাতির অধোগতি কী পর্যন্ত হইবে তাহা ভাবিলেও আশঙ্কিত হইতে হয়। একটু তলাইয়া দেখিলে উপলব্ধি হয় যে এই হিন্দু রক্ষণশীলতার অভ্যন্তরে একটি অহিতকর প্রবৃত্তি নিহিত আছে। ললিত কলাবিদ রাস্কিনের একটি কথা এস্থলে বড়ই প্রযোজ্য। তিনি এক সারগর্ভ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মানুষের চরম অবনতি তখনই সূচিত হয় যখন তাহার চরিত্র হইতে সম্ভ্রমের ও গুণগ্রাহিতার প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়। হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ঠ, হিন্দু ভিন্ন সকল জাতি ম্লেচ্ছ ও বর্বর তাহাদের নিকট আমাদের কিছুই শিখিবার নাই, এই প্রকার সংস্কারসকল যে দিন আমাদের জাতীয় চরিত্রে প্রবল অধিকার স্থাপন করিল, সেই দিন হইতে আমাদের উন্নতির মার্গ কণ্টকিত হইল।[৩] সেই দিন হইতে হিন্দু জাতি কূপমণ্ডুক হইল। অহংকার ও আত্মাদরে স্ফীত হইয়া জগতের শিক্ষা ও জগতের দীক্ষা তৃণজ্ঞান করিয়া অলক্ষিতভাবে অবনতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইল। আজ আমরা 'হিন্দু' বলিলে কেবল মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের প্রাধান্য বুঝি মাত্র। এই গণ্ডির

ভিতর ফোঁটা-তিলক কাটিয়া শাস্ত্রের ভেল্কী যিনি যত খাটাইবেন, তিনিই তত হিন্দু। সাধারণের নিকট জ্ঞানদ্বার রুদ্ধ। সে চাবি সেই গণ্ডীস্থিত গুটিকতক হিন্দুর হাতে। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন :

"যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দেখে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ' খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার কচ্ছে, ডান হাতে খাব কি বাম হাতে খাব, ডান থেকে জল নেব, কি বাম দিক থেকে, কট এট ক্রাং ক্রুং বিহি ইত্যাদি যে দেশের মূলমন্ত্র, তাহাদের অধোগতি হবে না তো আর কাদের হবে!"

সমাজ যখন এইপ্রকার হীনাবস্থায় পতিত হয়, তখন পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় অনন্ত অকল্যাণকর রীতিনীতি আসিয়া সমাজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যে জর্জরিত বাংলায় শীঘ্রই তাহার উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক 'বল্লালী কৌলিন্য' আসিয়া জুটিল। শাস্ত্রের কঠোর তাড়নায় জাত্যাভিমান, কুলমর্যাদা ইত্যাদির অসহনীয় কশাঘাতে উন্মত্ত হইয়া বাংলার বহুসংখ্যক লোক ইসলামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। অবশ্য কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠাতাগণের সংকল্প ভাল হইতে পারে, কিন্তু যে দিন হইতে কুলব্যক্তিগণ গুণগ্রামের পুরস্কার স্বরূপ না হইয়া বংশানুগত হইল সেই দিন বাঙালির অধঃপতনের চূড়ান্ত হইল। দেবীবর ঘটক আসরে অবতীর্ণ হইলেন। বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য 'কুলজী' প্রভৃতি গভীর গবেষণাপূর্ণ শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এইপ্রকার শৃঙ্খল পরিয়া বাঙালি নবদ্বীপের ব্যবস্থাশাসন দ্বারা নিজের আটঘাট বাঁধিয়া এমন করিয়া বসিলেন যে, ভাবী উন্নতির আর কোনো পন্থা রহিল না। এইপ্রকার কৃত্রিম অনৈসর্গিক বিধান সকল যখন সৃষ্ট হইল, প্রকৃতি দেবী তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন হেতু ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন। কুলমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বহুবিবাহরূপ কীট সমাজহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিল তিল করিয়া কাটিতে লাগিল। আজ বর্তমান বাংলা সেই পরিণাম ভোগ করিয়া হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছে। কৌলিন্যের সেই বিষময় ফল আজ বাংলার প্রতি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যে সুবৃহৎ বিষতরু সংবর্ধন

করিয়াছে, হায়, পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত গৃহস্থ সেই বিষতরুর উৎকট জ্বালাময়ী ছায়ায় দাঁড়াইয়া আজ ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে।

এই ভ্রান্ত কৌলিন্য, তৎপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-বিভাগ— উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যে দেশের কী ভয়ানক অকল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে আজ বিংশ শতাব্দীর উন্নত স্তরে দাঁড়াইয়া তাহা পরিষ্কার প্রতীয়মান হইতেছে। আমি তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব না, আমি তোমার অন্নগ্রহণ করিব না, আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব ইত্যাদিবৎ বৈষম্য যে কী অনিষ্টসাধন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা বিজ্ঞ কেন, যে কেহই অনুমান করিতে পারেন। তোমার ছায়া মাড়াইলে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে, তোমার স্পৃষ্টজল গ্রহণ করিলে অশৌচ হইবে ইত্যাদিবৎ কুসংস্কার যদি কুসংস্কার বিশেষ হইয়াই ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলে হয়তো তেমন ক্ষোভের কারণ হইত না। কিন্তু এই 'আমি বড় তুমি ছোট' ইহার ফল কতদূর দাঁড়ায় ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মনুষ্যহৃদয় সহানুভূতি-বারিতে সিঞ্চিত না হইলে কদাপি এ জগতে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতে পারে না। রোগশয্যায় শায়িত হইয়া কিংবা দারিদ্রের সহিত সংগ্রামে নিপীড়িত হইয়া যদি মানুষ একটু করুণার কটাক্ষ, একটু বন্ধুত্বের সুশীতল ছায়া, একটু আত্মীয়তার ভাব, একটু আশার সান্ত্বনা না পায়, পক্ষান্তরে 'তুই হীন', 'তুই ছোট', 'আমি তোকে ছুঁইব না', 'তোর প্রতি আমার কর্তব্য কী?' ইত্যাদিবৎ কঠোর শ্লেষপূর্ণ ভাব যদি তাহার প্রতি প্রকাশ করা যায়, জানি না ভালবাসা কোথায় কোন নিভৃততম প্রদেশে এ সংসার ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। এই ভালবাসা, এই সহানুভূতির অভাবে, যে সকল নিম্ন শ্রেণির লোক সমাজের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, তাহারা উচ্চশ্রেণির প্রতি ক্রমেই বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে শিখিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিল। ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিক সূর্যের প্রকাশ যেরূপ মনোরম, এই জাত্যাভিমানজর্জরিত অধঃপতিত বঙ্গসমাজে মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজীবব্যাপী প্রেমের অবতারণা সেইরূপ মনোমুগ্ধকর।

'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ, হরিভক্তিপরায়ণঃ।'— এই মহাবাক্য যদি যথাসময়ে বিঘোষিত না হইত, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুসমাজে কয়জন লোক বিদ্যমান থাকিত বলিতে পারি না। কিন্তু স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি এই মহান সাম্যভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না, জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্খল পূর্বের মতোই সমাজকে ব্যথিত করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে যাঁহারা সমাজের নেতা বলিয়া অহংকার করিয়া থাকেন তাঁহারা বৈষম্যের কল্পিত মাত্রাটা গভীরতর রেখায় অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেম নামক স্বর্গীয় ভাব দুইটি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছে। বস্তুত স্বদেশপ্রেম বলিয়া যে কিছু ভারতবর্ষে কখনও ছিল এমন মনে হয় না, কেননা এই বৈষম্য আজ বহুশত বর্ষ হইতে সমাজ হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত চুষিয়া নিঃশেষ করিতেছে। আপনার ও স্ত্রীপুত্রের জীবিকা সংস্থানই যে জাতির মুখ্য উদ্দেশ্য, যে জাতি প্রতিবেশীর দুঃখ বোঝে না, যে জাতি আপনার গণ্ডির বহির্ভাগে স্বীয় ভালবাসার আনন্দময় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, যে জাতির সম্মুখে সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ— জিজ্ঞাসু না হইয়া শাস্ত্রোক্ত বচনে আত্মসমর্পণ, সে জাতির হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম আসিবে কী প্রকারে? যে দেশের সমাজ হাতে ধরিয়া আশৈশব 'তুমি বড়, এ নিকৃষ্ট' ইহাই সযত্নে শেখায়, সে দেশে জাতীয়তার ভাব আসিবে কী প্রকারে? সে দেশ ক্ষুদ্রের প্রাণের আবেগের সহিত আপনার মহৎ প্রাণের উচ্ছ্বাস মিশাইবে কেমন করিয়া?

ধীরে ধীরে কী এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসিয়া পৌঁছাইল। ইংরাজ-রাজের সমাগমে প্রতীচ্য দেশের এক প্রবল হাওয়া আসিয়া প্রাচ্য জলধি বিচলিত করিল। সেই আবর্তে হাল ধরিতে গিয়া অনেক কর্ণধার ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতায় আপনাদিগের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই আমূল পরিবর্তনের দিনে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া বাংলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতকে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইলেন। সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব, আমি বলি, পূর্ব মহাদেশের সৌভাগ্যাকাশের সর্বপ্রথম নক্ষত্র।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বাঙালির এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত

হইল। অল্পসংখ্যক ইংরাজ বনিক স্বীয় বুদ্ধি ও কৌশলবলে যখন বিপুল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তখন ওই সাম্রাজ্য শাসন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দেশীয় কর্মচারীর আবশ্যক হইল। সুচতুর ইংরাজ বুঝিলেন যে, রাজ্য সংস্থাপনের মূলে শাসিত প্রজাবৃন্দের সহানুভূতি লাভ প্রয়োজন। সুতরাং ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙালি কর্মচারী দেওয়ানি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙালি এই সুযোগের অপব্যবহার করিল। কোনো কোনো স্বার্থান্ধ কর্মচারী এই সুযোগে বিপুল অর্থোপার্জন করিয়া লইলেন বটে, স্বীয় অর্থলিপ্সা নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত পশুবৃত্তির আশ্রয় লইলেন ইহাও সত্য বটে, কিন্তু রাজসরকার বিভাগেই হউক, কী সওদাগরি বিভাগেই হউক কিছুতেই প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে পারিলেন না।

আমাদেরও সর্বনাশের সূচনা সেই দিন হইতে হইল। শিল্প বাণিজ্যের বিপুল বিপ্লব পাশ্চাত্য জগৎকে বিচলিত করিল। বাষ্পীয় শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কল চালিত হওয়াতে সাধারণ শ্রমজীবীদিগের আর্থিক অবস্থার ভীষণ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংলন্ডের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পেও পরিবর্তন সংঘটিত হইল। পূর্বে ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙা প্রভৃতি স্থানের মিহি সূতার কোটি কোটি টাকার[৪] কাপড় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টগণ বিলাতে পাঠাইতেন ও এইপ্রকারে বিলাতের কিয়দংশ অর্থ এদেশে প্রত্যাবর্তন করিত। কিন্তু এই বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার সে পথ বন্ধ করিয়া দিল— শ্রমজীবীদিগের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই পরিবর্তনে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবীর সর্বনাশ হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'দেশের তাঁতি' আর 'দেশের জোলা' ইহাদিগকে অন্নাভাবে জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সর্বনাশ স্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না— প্রাকৃতিক নিয়মে দুর্বলকে পরাজিত হইতেই হইবে, বলশালীর জয় অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রকারে দেশীয় শিল্পের কোমল মূলে সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত পড়িল। ভারতীয় শিল্প নির্মূল হইল। বৈদেশিক শিল্প ভারতবর্ষের অভাব মোচনে নিয়োজিত হইতে লাগিল, আর কোটি কোটি টাকা দেশ ছাড়িয়া বৈদেশিক

সমৃদ্ধি বর্ধনে ব্যয়িত হইতে লাগিল। ইংলন্ড হইতে দেখিতে দেখিতে বহু শত ব্যবসায়ী কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। আর একদিক হইতে এদেশজাত কার্পাস, পাট, শস্য প্রভৃতি ইংলন্ডে চালান করিতে লাগিলেন। আমাদের দূরদৃষ্ট, তাই নিজের কার্পাস ও পাট অপরের দ্বারা বুনাইয়া শতগুণ মূল্যে কিনিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে লাগিলাম। ম্যানচেষ্টর বৈদেশিক লক্ষ্মী আপনার গৃহে আবদ্ধ করিলেন, আর আমরা ভিখারি সাজিয়া রাস্তায় নামিতে বাধ্য হইলাম।

এই সময় বাঙালি কেরানির সৃষ্টি ইংরাজ বণিক প্রজাপতির কৃপায় আরম্ভ হইল। ইংরাজ বণিক বাঙালির সহায়তা ভিন্ন ব্যবসায় চালাইতে পারিতেন না; ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদান প্রথমত প্রায় সমস্তই বাঙালি কেরানির হাত দিয়াই হইত। অনেক নিরক্ষর হৌসের মুৎসুদ্দিরা এই সুযোগে ক্রোড়পতি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অশিক্ষিতের হাতে বিপুল ঐশ্বর্যের আগমনে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্ররোচনায় ও স্বাচ্ছন্দ্যের বাতাসে বিলাসিতার আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—কর্মক্ষম হইয়াও বাঙালি স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা স্বাধীন জীবিকা অর্জন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে গুজরাট, রাজপুতানা (বিকানীর) ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সমস্ত ব্যবসা দখল করিতে লাগিলেন, আর বাঙালি ধ্রুবতারার ন্যায় কেরানিগিরি লক্ষ্য করিয়া ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন। সুতরাং উচ্চশিক্ষার অভিমানে জ্বলিয়া পুড়িয়াও ২০৲।২৫৲ টাকার কেরানি বৃত্তিতেই জীবনযাপন বাঙালি যুবকের চরম পুরস্কার নির্ধারিত হইল। এই প্রকারে ইংলন্ডের রাজলক্ষ্মীর অনুগামী হইয়া বাঙালি কেরানি পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল, আর কীসে চাকুরি 'বাগাইব' মস্তিষ্কের প্রখরতা উহাতেই ব্যয়িত করিতে লাগিল। বস্তুত উদরের উৎকট চিন্তা বাঙালির মনুষ্যত্ব পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। সাধারণ সরলতা ও সাহসিকতা পর্যন্ত হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইয়াছে, এখন বুদ্ধির প্রাখর্য ঘৃণিত চাটুকারিতায় ও ততোধিক ঘৃণিত কপটতায় দৃষ্ট হইতেছে। বিশ্বস্ত

সূত্রে শুনিয়াছি মফঃস্বলে কোনো ইংরাজ জজের প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ হয়। এই নববিবাহিতা পত্নীর বিয়োগজনিত নিদারুণ শোক অপনোদন করিবার নিমিত্ত উক্ত জজ মহাশয় প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মৃত পত্নীর কবর সন্নিহিত হইয়া নির্জনে অশ্রুপাত করিতেন। তদ্দর্শনে একজন সুচতুর উমেদার বুঝিল, এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। সে পরদিবস কিছু অগ্রে যাইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কৃত্রিম কান্না কাঁদিতে লাগিল ও সজোরে বৃক্ষে করাঘাত করত 'মা আমার চলিয়া গিয়াছেন', 'আর আমায় কে পালন করিবে' ইত্যাদিবৎ চিৎকার করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য রাজপুরুষ অচিরে এই সহানুভূতির পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। বস্তুত চাকুরি যাহাদের উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন দাসবৃত্তি গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে একটি কৌতুকাবহ প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাজারিবাগ অঞ্চলে কোনো মুসলমান ভদ্রলোক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর্দালির (Orderly) পদপ্রার্থী হন। তাঁহার ৫০০/৬০০ টাকা বার্ষিক আয়ের জমিজমা ছিল ও স্বীয় গ্রামে সম্ভ্রান্ত বলিয়া কিছু প্রতিপত্তিও ছিল। লোকে তাঁহার ঈদৃশ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, 'সরকারী নোকরী, ইসমে ইজ্জত বাড়তা হ্যায়।' হায়, যে দেশে আজ ইজ্জতের এই অর্থ, জানি না সে দেশে অপমান কী?

আর একদল লোক দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা প্রচলিত হিসাবে ইংরাজি শিক্ষিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অদৃষ্টের দোষ দিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ দায়িত্ব স্খালন করিয়া থাকেন। এই অর্ধশতাব্দী ইংরাজি শিক্ষার ফলে দেশে কিছুমাত্র শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতিমাত্র হইল না, ইহাতেই তাঁহাদের হৃদয় ভাঙিয়া যায়। অবশ্য বলিতেই হইবে, এরূপ স্থলে বক্তৃগণ প্রায়ই অন্তঃসারশূন্য, কেন না 'হা হতোহস্মি' করিবার ক্ষমতা বালক এবং স্ত্রীলোকেরও যথেষ্ট বর্তমান। এই শ্রেণির লোকগণ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রয়াসী নহেন, কেন না উহাতে যথেষ্ট শ্রমের প্রয়োজন। অথচ

দেশের কথা কহিতেই হইবে; কখনও যা সত্য সত্যই তাঁহাদের প্রাণে একটু আধটু লাগে, তাই যেন 'স্বদেশ' 'স্বদেশের যুবক' ইত্যাদি আশার কথা কহিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট আমার আবেদন এই যে, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি একদিনের কর্ম নহে, উহাতে আরব্যোপন্যাসে উল্লিখিত আলাদিনের প্রদীপের ন্যায় এমন কিছু ভোজবাজি নাই যে, প্রত্যূষে স্বপ্নময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া স্বদেশের শিল্পে রাস্তাঘাট মাঠ থরে বিথরে সজ্জিত দেখিতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা আছে। ইংলন্ডের বর্তমান শিল্পের যে সমৃদ্ধি, ইহার বিকাশ যে কী প্রকার ক্রমিক তাহা ভাবিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, অর্ধশতাব্দী জাতীয় জীবনের অধ্যায়ে সামান্য পংক্তিমাত্র। প্রায় ৫০০ বর্ষপূর্বে যে শিল্প-বাণিজ্যের সূচনা মাত্র হইয়াছিল, আজ তিল তিল করিয়া সেই শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া ইংলন্ড তাহারই ফলভোগ করিতেছে। আমরা অদৃষ্টের দোষ দিয়া নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকি, 'কী করিতে হইবে', 'কেমন করিয়া হইবে' ইত্যাকার পুরুষত্ববিহীন বাক্যালাপে বহুমূল্য সময় ক্ষেপন করি, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের নিপুণতা, তাহাদের কার্যতৎপরতা, তাহাদের একাগ্রতা ও শ্রমশীলতা অর্জন করিবার প্রয়াস একবারও পাই না। এই সব গুণরাশি না থাকিলে যে জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনও আপনার স্থান অধিকার করা যায় না তাহা বিস্মৃত হইয়া 'সুযোগ পাইলাম না' বলিয়া আলস্যের অঙ্কে আশ্রয় লইয়া থাকি। কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যে কেন, জগতের সর্ববিধ ব্যাপারেই একটু সাহস করিয়া ঝাঁপ দিতে না পারিলে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুত জলে না নামিয়া মৎস্য ধরিবার প্রবৃত্তি ভারতের ন্যায় সুষুপ্ত দেশেই সম্ভব। কিন্তু ইহাই অত্যাশ্চর্য যে, এই সুষুপ্তি অধুনা দুর্ভিক্ষের প্রবল সংঘাতে ভাঙা সত্ত্বেও এ ঘুমন্ত অলস জাতিতে আপনার পায়ে দাঁড়াইবার প্রবল ইচ্ছা এখনও জন্মিল না। তন্দ্রা ও আলস্যের সম্মোহন শক্তি এ মৃতপ্রায় জাতির অস্তিত্ব লোপ করিতে বসিয়াছে, বৈদেশিক শক্তির আত্মম্ভরিতাপূর্ণ পদাঘাতে মান, সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্ব বহুকাল ঘুচিয়াছে, কিন্তু জানি না 'এ কেমন ঘোর'! যে দেশ শস্যসম্ভার ও ঐশ্বর্যে অতুলনীয়, যে দেশের স্বাচ্ছন্দ্য উপমার বিষয়, সেই স্নেহময়ী জননীর আদরের সন্তান

আজ কঙ্কালসার হইয়া বৃক্ষপত্রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য, জঠরানলের প্রবল তাড়নায় (হায়, সে মর্মান্তিক দৃশ্য!) জননী নিজে সন্তানের গ্রাস কাড়িয়া খাইয়াছেন! এই দুর্ভিক্ষের, এই ভীষণ দৈন্যের জন্য দায়ী কে? আমার মনে হয়, প্রথমত বিশেষভাবে আমরা, দ্বিতীয়ত বৈদেশিক বাণিজ্য। এই বৈদেশিক বাণিজ্য আমাদেরই অপদার্থতার সুযোগ পাইয়া আমাদিগকে কাঙাল সাজাইয়াছে— ইহাতে বৈদেশিক বণিকের দোষ কি? কেন বিলাতি পণ্যে বাজার পূর্ণ করিলাম, কেন বিদেশি শিল্পের হাতে আপনার দেহ ঢালিয়া দিলাম। সে ত আমাদেরই দোষ, সে ত আমাদেরই অভিরুচির অবশ্যম্ভাবী ফল। কেন স্বদেশজাত শিল্পের আদর শিখিলাম না, কেন দেশের শিল্পের উন্নতিকল্পে, কল্পনার সুখশয্যা ছাড়িয়া কোমর বাঁধিয়া নামিতে শঙ্কিত হইলাম! আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়া প্রতিবেশী অস্ত্রনির্মাতার অপবাদ করিলে কী হইবে?

আজ সমস্ত ভারতের আমদানি ও রপ্তানি ধরিলে প্রায় ৩৪৪ কোটি টাকা হইবে। [ ] ই অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের কোনো ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও কি বাঙালি ব্যবসায়ী বা বণিকের হাত দিয়া যায়? আমরা পশ্চিমপ্রদেশীয় ভ্রাতাদিগের কার্যকুশলতা ও ব্যবসায়-তৎপরতায় হিংসাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে অর্ধশিক্ষিত ‘মেড়ুয়া’, ‘ছাতুখোর’ কিংবা ততোধিক কোনো প্রীতিকর অভিধানে ভূষিত করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুত ইহারাই আজ বাংলার ব্যবসায়ী— ইহাদেরই নিকট আমাদের শিখিতে হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্যে বিদ্যাধ্যায়ীর ন্যায় না শিখিলে কখনও কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা যায় না। ইহা এমনই বিষয় যে, হাতে করিয়া না দেখিলে ও না শিখিলে কখনও সম্যক উপলব্ধি হয় না। দেশে এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, চাকুরি পরিত্যাগ পূর্বক ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে। আজকাল প্রায় সকল যুবকই বলিয়া থাকেন ‘ভাল চাকরি না পাই দোকান খুলিব।’

ইহা অতি উত্তম চেষ্টা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের রীতি সুপ্রশস্ত। বাণিজ্য-ব্যবসায়েচ্ছু যুবকগণ প্রথমত কোনো শিল্পশালা কী দোকানে শিক্ষানবীশ (apprentice) হইয়া কিছুকাল যাপন

করুন। এই সময়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও একাগ্রতার সহিত কর্ম করিয়া ব্যবসায় কিংবা শিল্প সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হউন, তৎপরে স্বীয় অর্থেই হউক, কী যুক্তভাণ্ডার খুলিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। ইহাতে কৃতকার্যতা প্রায় একপ্রকার নিশ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে নব্যযুবকরা বহু অর্থ ও চশমা, চুরুট, চেন লইয়া বাজারে অবতীর্ণ হন। এই সকল যুবক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় লালিতপালিত, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুর কখনও বা নবপরিণীতা ভার্যার স্নেহরসে সিক্ত ও পরিবর্ধিত। এই সুখময় কল্পনার জীবন হইতে সহসা সংসারের কঠিন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, উহারা চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকে, কৃত্রিম বন্ধু ও ব্যবসায়ীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শীঘ্রই বাইবেল-উক্ত যুবকের ন্যায় (prodigal son) পিতার চরণে উপস্থিত হয়। বস্তুত এতাবৎকালের মধ্যে কতিপয় ভদ্রযুবক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত কি অশিক্ষিত দোকানদারের প্রতিযোগিতায় তাহাদিগকে দোকানপাট গুটাইতে হইয়াছে। শিক্ষিতের দোকান ও সাধারণ দোকানে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

সাজসজ্জার চটক, আলো, টেবিলক্লথ ইত্যাদির বাহার ছাড়িয়া দিলেও, দোকানে তত্ত্বাবধান সম্যকরূপে না হওয়ায় কর্মচারীর উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং দোকান পরিত্যাগ করিয়া ময়দানে ক্রিকেট ক্রীড়ায় ব্যস্ত থাকার দরুণই অধিকাংশ যুবক ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হইয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের যুবকগণের বণিক-জীবনের এই প্রধান কথা কয়েকটি স্মরণ রাখিয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে, নচেৎ কৃতকার্য হইবার আশা সুদূরপরাহত।[৫]

এই বাণিজ্য-দারিদ্র্যের কথা ভাবিলে সত্যই প্রাণে আঘাত লাগে। বাংলা দেশে প্রায় ৪০টি পাটের কল, কিন্তু ইহার একটিরও মালিক বাঙালি নহে। বাঙালি স্বদেশি হইলেন। কিন্তু এই ভাব সংরক্ষণের জন্য বোম্বাই-এর দিকে 'হাঁ' করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর, শত বাধা বিঘ্ন প্রতিযোগিতা অতিক্রম করিয়া বোম্বাই অধিবাসিগণ কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছেন ও তাহার ফললাভ করিতেছেন। আমাদেরও কি তাহাই কর্তব্য নহে? আজ আমরা এমন অধম হইয়া পড়িয়াছি যে, বার্মিংহাম আজ

যদি বিরূপ হইয়া বসেন, নিবের অভাবে কালই আমাদের সাধের কলমপেশা ঘুচিবে। এতদিন আমরা ম্যানচেষ্টরের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। ম্যানচেষ্টর আমাদিগকে সাজাইলে সাজিতাম নচেৎ—বস্ত্রহীন, কিন্তু বিধাতার অনুজ্ঞায় আজ আমরা দেশীয় জিনিসে লজ্জা নিবারণে অনেকটা সমর্থ হইয়া উঠিতেছি, ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। মৃত জাতির প্রাণ আজ যে উৎসাহ রসে সঞ্জীবিত হইবার সূচনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে কাহার হৃদয় পুলকিত না হয়। আজ নূতন দিন আসিয়াছে, পৃথিবীর পুরাতন মুখ মুছিয়া গিয়াছে, নূতন আলো মাখিয়া, নূতন আকাশে আজ নূতন প্রভাকরের আগমন যেন ঊষার পাখি গাহিয়া গিয়াছে! এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দিন এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ— এই যুগান্তকারী ঘটনানিচয় স্পষ্টই যেন এক নূতন মার্গ পৃথিবীর ঘুমন্ত জাতির নিকট উদ্ঘাটিত করিতেছে।

বাঙালির শক্তি ও সামর্থ্যের কীরূপ অপচয় হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাঁহাদের আদালত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন উকিলগণের কীরূপ দুর্দশা। মকদ্দমার অপেক্ষা উকিলের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে— কাজেই অনেক নব্য উকিলের উপার্জন কত তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখনও আড়াই হাজার গ্রাজুয়েট আইন পড়িতেছে। ইহারা আইন পাশ করিয়া কী উপার্জন করিবে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন? যে জিনিসের আদৌ কাট্‌তি নাই— যাহা গুদামে পচিতেছে— তাহাই আবার এত অধিক পরিমাণে তৈয়ার করা কি পাগলামি নয়?

অথচ অপরদিকে দেখ ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা কত ঐশ্বর্য লাভ করিতেছে। শ্রীযুক্ত কেশোরাম পোদ্দার ৬৬।।০ লক্ষ টাকার সমরঋণ ক্রয় করিয়াছেন। সেদিন রায়বাহাদুর শিওপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা এক লক্ষ টাকার কাপড় বিতরণ করিলেন। বোম্বাইয়ের ধনকুবের সওদাগরগণও নানা সৎকার্যে অজস্র দান করেন। তাতা (টাটা?—অ.না.) বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আর কত দৃষ্টান্ত দিব? এই কলিকাতা শহরেই দেখা যাইতেছে ইউরোপীয়ান, মারোয়াড়ি, পার্শি, ভাটিয়া, দিল্লিওয়ালা

প্রভৃতি দূর দেশ হইতে আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছে আর বাঙালি নিশ্চেষ্টভাবে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। কলিকাতার অনেক অধিবাসীই তো বাঙালি নহে এবং পেটের জ্বালায় হাহাকার করিতেছে। দশ হাজার ভাটিয়া কলিকাতায় সওদাগরি করিয়া ধনবান হইতেছে আর মসীজীবী বাঙালি আধপেটা খাইয়া কোনোমতে বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু সর্বদেশব্যাপী শিল্পোন্নতির প্রবল চেষ্টা না থাকিলে কখনও মাতৃভূমির সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইতে পারে না। যেমন বোম্বাই-এ সেইরূপ বাংলায়ও দেশবাসী কর্তৃক পরিচালিত কলকারখানার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই শিল্পোন্নতির বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়— শিল্প শিখিবার ব্যবস্থা কোথায়? পাশ্চাত্য দেশের উন্নত শিল্পশালা সমূহে বহু অর্থ ব্যয়ে ও ক্লেশ সহ্য করিয়া শিক্ষানবীশ না হইতে পারিলে, উহা কখনও সম্ভবে না। সত্য, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৈদেশিক বিদ্যালয়সমূহে শিল্পশিক্ষা অত্যল্প লোকের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। এ দরিদ্র দেশে সেরূপ ব্যয় বহন শিক্ষার্থীর পক্ষে যথার্থই ক্লেশদায়ক স্বীকার করি। কিন্তু এই বিঘ্নরাশি সত্ত্বেও অধ্যবসায় ও মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা দেশে বসিয়াই শিল্পের আংশিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারা যায় সন্দেহ নাই। তৎপরে পরিমিত সংখ্যক কর্মঠ যুবকগণকে উক্ত বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বিদেশে পাঠাইলে শিল্পের উন্নতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ, যাঁহারা যথার্থই কর্মক্ষম হইতে পারিতেন, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াই তাঁহারা চাকুরির অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, সামান্য ২০/২৫ টাকার মসীব্যবসায়ী হইয়াও অর্ধানশনে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত কালযাপন করিতে পারিলে কৃতার্থ হন। বস্তুত এই সকল হতভাগ্য তরুণ বয়স্ক যুবকবৃন্দের আজীবনব্যাপী ক্লেশের জন্য সমাজ দায়ী। কিশোর বয়স অতিক্রম না করিতেই, শিক্ষার ও জ্ঞানোপার্জনের প্রবেশমার্গে উপস্থিত না হইতেই, ভাল মন্দ ইত্যাদির সম্যক উপলব্ধি হইবার পূর্বেই, সমাজ পরিণয়ের কঠোর নিগড়ে বাঁধিয়া, যুবকবৃন্দের ভবিষ্যৎ আকাশ গভীর কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত করিয়া বসেন। আশার ক্ষীণালোক সমুদ্রবক্ষস্থিত

আলোক-গৃহের (Light House) ন্যায় সংসার-কাননের বিহঙ্গ, তরুণবয়স্ক যুবকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে যে মহৎভাব সকল শিক্ষার প্রভাবে প্রস্ফুটিত করিতেছিল, সে আলোকমালা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন ও সন্নিকটবর্তী হইতেছিল, দারিদ্রময় পরিণীত জীবনের বিষম বাত্যাসংঘাতে হায়, সে আলোক নিবিয়া গেল, সংসারসমুদ্রে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার প্রবল ঊর্মিমালার তাড়নায়— ততোধিক সমাজের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে যুবকের জীবনতরি ডুবিল! যে দেশের সমাজ, উত্থানপ্রয়াসী যুবকবৃন্দের মস্তকে এইরূপ লগুড়াঘাত করে, সে দেশের যুবক ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়া 'জীবিকা জীবিকা' করিয়া ছুটিবে, তাহা বিচিত্র কী? সে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ব্যাধি হইবে ইহাই তো স্বাভাবিক। তরুণ যুবক যে মুহূর্তে ত্রয়োদশবর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ষণ হইতে বাহির হইল, অমনি হয় আইনের দুয়ারে বটপত্র চর্বণে অথবা ঘৃণ্য কেরানিগিরিতে নিযুক্ত হইল— সেই দিন বহুশ্রমার্জিত বিদ্যার সমাধি হইল! হায়! যে দেশে অর্থ ক্রিমি-কীট বলিয়া পরিগণিত হইত, যে দেশে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনই আজীবনব্যাপী কর্ম ছিল, যে দেশের তপোবনে বিহঙ্গকলকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দের ব্রাহ্মমুহূর্তের আবৃত্তির স্বর কাননভূমিকে মুখরিত করিত, সেই দেশেই আজ বিদ্যার্জন মসীবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্বাহের উপায় মাত্র! আমরা পাশ্চাত্যদেশীয়দিগকে অর্থোপাসক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, উহা জম্বুকের দ্রাক্ষাফলে অনভিরুচির ন্যায়, অথবা দুর্বলের ক্ষমাশীলতার ন্যায় উপহাসের বিষয় মাত্র। বালককাল হইতে যে দেশের যুবক পিতা-মাতা গুরুজনের নিকট রৌপ্যখন্ডের মধুর নিনাদের বার্তা শুনিয়া আইসে, যে দেশের বিবাহ ক্রয়-বিক্রয়ের নামান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে দেশের ভর্তার ভালবাসা শ্বশুরপ্রদত্ত বিত্তের পরিমাপক স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহাই যে দেশের সমাজের ছবি সে দেশের আদর্শ 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া যদি কোনো শাস্ত্রব্যাখ্যাতা পণ্ডিত অথবা সমাজের নেতা বড়াই করেন, জানি না পিশাচবৃত্তি কাহাকে বলে! বাস্তবিক বাঙালির ন্যায় অর্থোপাসক জাতি আর কুত্রাপি নাই। ইংলন্ড,

জার্মানি, ফ্রান্স আজ ঐশ্বর্যশালিনী সন্দেহ নাই, বাণিজ্য শতধারে ওই সকল দেশে সম্পদরাশি ঢালিতেছে বটে, কিন্তু এই অর্থাগম সত্ত্বেও জ্ঞানস্পৃহার কিঞ্চিৎ মাত্র হ্রাস পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত ইহারাই সরস্বতীর প্রকৃত উপাসনা করিতেছেন। অনন্যমনে জ্ঞানান্বেষণই যেন উহাদের অর্থলাভের হেতু বলিয়া অনুমিত হয়। এই জ্ঞানান্বেষণের ফলে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া, প্রকৃতির শক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ পার্থিব জগতে যুগান্তর উপস্থিতকরণে সক্ষম হইয়াছেন। আর আমাদের মৃতকল্প স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণ— কেবল একজামিনের পর একজামিন পাশ করিয়া যাইতেছে— বাস্তবিক একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এমন হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ— শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিও আর কোনো দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে; তাঁহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্নমনে প্রত্যাবর্তন করি।

অবশ্য এইরূপ ঘটনার জন্য ছাত্রগণ দায়ী নহে— যে ভ্রমপূর্ণ নিয়মে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে সেই নিয়মই দায়ী। যে সকল বিষয়ে বালকগণ স্বভাবত অনুরাগ প্রদর্শন করে— যেমন তাহাদের নিজের শরীরের কথা, নিজের গ্রামের কথা প্রভৃতি— সে সকল বিষয়ে তাহাদের কিছুই পড়ানো হয় না, অথচ এমন সব বিষয় তাহাদের পড়িতে হয় যাহার সহিত তাহাদের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই— যেমন দূরদেশের ভূগোল ও ইতিহাস। যিনি সাহিত্যের শিক্ষক তিনি কথার প্রতিশব্দ, ব্যাকরণের কচকচি এবং Allusion প্রভৃতির দ্বারা ছেলেদের এমনই প্রপীড়িত করিয়া

তুলেন যে ছেলেরা ভাবিবার অবসরই পায় না যে সাহিত্যে একটা রস বলিয়া জিনিস আছে। অনেকস্থলে দেখা যায়, যাঁহার হস্তে গণিত শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত হয় তিনি বোধ হয় ভাবেন গণিত শাস্ত্রের উপর ছেলেদের একটা বিজাতীয় বিভীষিকা জন্মাইয়া দেওয়াই তাঁহার প্রধান কর্তব্য, নহিলে তিনি সাধারণ ছাত্রগণকে অনর্থক জটিল সমস্যাসমূহ পূরণ করিতে দিয়া তাহাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ করিয়া তুলেন কেন? এইরূপ শিক্ষাদানের ফল যাহা হইবার তাহাই হয়। ছেলেরা যে দিন পরীক্ষাসমূহ উত্তীর্ণ হয় সেই দিন হইতেই মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে। জ্ঞান চর্চায় যে কীরূপ অতুলনীয় আনন্দলাভ হইয়া থাকে তাহা তো সে কোনো কালে শিখে নাই।[৬]

স্কুল-কলেজে অসার ও নীরস জ্ঞান আহরণের চেষ্টায় যেমন বালকগণের মস্তিষ্কের অপব্যবহার হয়, তেমনই যুবক ও প্রৌঢ়গণ তাহাদের অবসরকাল বিদ্যানুশীলনে ব্যয় না করিয়া গালগল্প ও নভেল পাঠ দ্বারা নষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা বুঝে না একখানা নিকৃষ্ট নভেল পড়িয়া যেটুকু আনন্দ পাওয়া যায়, ইতিহাস, জীবন-বৃত্তান্ত বা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িলে তাহার অপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ হয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি হয়।

আর কয়েকটি কথা বলিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে হয়তো আবেগের বশে দুই একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি পাঠক বিশ্বাস করিবেন যে, এই সকল কথা আমি বিদ্বেষের বশে লিখি নাই, জাতীয় দারুণ দুরবস্থা জনিত দুঃখই আমাকে ওইরূপ বলাইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গৌরবের কথা আমি ভুলি নাই; পূর্বপুরুষগণের পবিত্র স্মৃতির প্রতিও আমি কাহাকেও সম্ভ্রমহীন হইতে বলি না। কিন্তু যাঁহারা সেই স্মৃতির প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত হইতে গিয়া তাঁহাদিগের ভুলগুলিকেও অলংকার-বিভূষিত করিতে চাহেন— সে গুলির অনুকরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জন্যই আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা।

কুল্লুকভট্ট ও রঘুনন্দনের অপূর্ব পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনিয়াই যাঁহারা

দেশে সেই প্রাচীন টোলের শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন করিতে চাহেন, নূতনকে একেবারে তাড়াইয়া পুরাতমকে তাহার স্থানে আনিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সহিত আমি কখনও একমত হইতে পারি না। নূতন ভারতবর্ষীয় জাতি, নূতন ও পুরাতন উভয়ের সম্মিলনে গঠিত হইবে। অন্ধবিশ্বাস জাতীয় উন্নতির মূল হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দু জাতির মহান আদর্শ ভুলিলে আমাদের চলিবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্তমান সময়ে উক্ত আদর্শের অনুকরণ কতটা সম্ভব তাহাও আমাদিগকে ভাবিতে হইবে।

জাতিভেদ ও স্মৃতি ও সামাজিক বহু ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে যে এক শান্ত, উদ্বেগবিহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন জীবনযাত্রাপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের প্রশংসিত যে সুন্দর পল্লিমণ্ডলসমূহ সংগঠিত হইয়াছিল— যেরূপ সমাজ সংঘটন পাশ্চাত্য দেশের কাউন্ট টলস্টয় প্রভৃতি মনীষীগণের ও সোসিয়ালিস্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন, ভারতবর্ষীয় যে সমাজশৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দুজাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতিগণের তুলনায় অনেক কম, ভারতবর্ষের যে প্রাচীন পুণ্য-সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশের দারুণ জীবনসংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়, আমরা যেন সে সকল কথা না ভুলি। কিন্তু তাহার পরেই যে একটা 'কিন্তু' আছে আমরা যেন সে 'কিন্তু'টাও বাদ না দিই। যতদিন মানুষের স্বাভাবিক দুরাকাঙ্ক্ষা না বিদূরিত হইবে, যতদিন মানুষের মনে তাহার সহচরগণের উপর প্রাধান্য লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিবে, যতদিন এক জাতি অন্য জাতিকে নিজের স্বার্থের জন্য দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, ততদিনের মধ্যে যে জাতি নিজেদের সমাজকে সোসিয়ালিজমের (Socialism) আদর্শে গঠিত করিবে, সে জাতিকে যে শীঘ্রই অন্যের দাসত্বে জীবন কাটাইতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

এমার্সন বলেন : Unviersities are of course, hostile to geniuses; which seeing and using ways of their own discredit routine.— বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিভার বিকাশের সহায়ক নহে, অন্তরায়।

ধরাবাঁধা নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে না। বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে এমার্সন যে কথা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় নব্য স্মৃতি ও টোলের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সে কথা আরও অনেক বেশি জোরে বলা যাইতে পারে। এমনকী এই শিক্ষা যে জাতীয় প্রতিভা হননের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগের ন্যায় কার্য করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এখনও গোঁড়া লোকে বলিয়া থাকে 'আমাদের হিন্দুধর্মের কী অপূর্ব মহিমা, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মুহূর্তের সমস্ত কার্যই শাস্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।' এই শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তশক্তিসম্পন্ন লোক উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা হইয়াছিল, মহাশক্তিমান পুরুষ জন্মাইবার পক্ষে সেরূপ কার্যকরী হয় নাই। কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য মহাশক্তিশালী পুরুষের— প্রতিভাবান পুরুষের একান্ত প্রয়োজন— 'একা সিংহে নাহি পারে অজারসংহতি।'

তাই ফরাসি জাতি যখন বিলাস ও রাজকীয় অত্যাচারের পঙ্কে পড়িয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন রুশোর সাহিত্যিক প্রতিভা তাহাদের মধ্যে নবভাবের প্রচারপূর্বক ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টি করিয়া স্বজাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আবার যখন বৈপ্লবিক সৈন্যগণ রাজপক্ষীয়দের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হইতেছিল তখন ইঞ্জিনিয়র কার্ণো তাঁহার নবব্যূহ রচনাপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া বিপক্ষের গতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আবার যখন বিপক্ষগণ ফ্রান্সের বারুদ প্রস্তুত বন্ধ করিবার জন্য বিদেশ হইতে সোরার আমদানি বন্ধ করিল, তখন বৈজ্ঞানিক গোবর প্রভৃতি জীবদেহাবশেষ হইতে, সোরা প্রস্তুত করিয়া ফ্রান্সকে রক্ষা করিলেন।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই প্রতিভা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকিয়া বিকশিত হইতে পারে না। স্বাধীন চিন্তার অভাবে উহা জন্মিতে পারে না। সাধারণ লোক হইতে বিভিন্ন ভাবে দর্শন করা, চিন্তা করা ও কার্য করাই উহার প্রধান লক্ষণ। একজন যে ভাবে চিন্তা করিয়াছে, যে ভাবে কার্য করিয়াছে— সে ভাবে কার্য করিলে উহার নিজের বিশেষত্ব থাকে কোথায়? প্রতিভার একটি কার্য দেখিয়া, উহার একদেশ দেখিয়া উহাকে বিচার করিলে

চলিবে না। উহাকে খন্ড খন্ড ভাবে বিচার করা চলে না। উহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। ইহা ঝঞ্ঝাবাত, স্রোতস্বিনী প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতির এক মহাশক্তি। কয়টা পাখির বাসা ভাঙিয়াছে, কয়টা লোক মরিয়াছে, কী কয়টা বাগান ভাঙিয়াছে, তাহা গনিয়া উহাদের কার্যের হিসাব করিলে চলিবে না— সেই সঙ্গে উহারা কত নগরের দূষিত বায়ু বিদূরিত করিয়া, কত জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া, কত জনপদের পানীয় সংস্থান করিয়া— অসংখ্য জীবের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে— তাহার বিষয়ও ভাবিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধঃপতনযুগের ভারতবর্ষ হইতে প্রতিভা বুঝিবার শক্তি অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়াছে; কত শক্তিমান পুরুষকে জীবনের একটা ভুলের জন্য সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে, অনেক সময়ে বিপক্ষদলেই যোগ দিতে হইয়াছে। শত্রুতার সহায়তায়, একটু পেঁয়াজের গন্ধ, ভয় বা লোভে পড়িয়া একদিন অখাদ্য ভোজন কত গৃহস্থের জাতিপাতের কারণ হইয়াছে। বাস্তবিকই হিন্দুগণ যেরূপ কঠোরভাবে সামাজিক নিয়মলঙ্ঘনকারীকে সমাজচ্যুত করিয়াছে, তাহা আশ্চর্যজনক। হায়, সেকালের নিয়মকর্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। আপনারা কি চাণক্যপণ্ডিতের মহাবাক্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন (সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ) যে আপতকালে অর্ধেক পরিত্যাগ করিতে হয়! সে কালের দাম্ভিকগণ! যদি তোমরা কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইতে, যাহাদিগকে তোমরা সামান্য কারণে সমাজচ্যুত করিয়া অশেষ কষ্টে নিপতিত করিয়াছিলে, তাহাদিগের ক্লিষ্ট আত্মা তোমাদিগকে শাপ দিয়াছিল, 'যেমন আমাদিগকে সামান্য অপরাধে জাতিচ্যুত করিতেছ, তেমনই তোমাদেরই বংশধরগণ রেলে, পুলিশে ও অন্যান্যবিধ দাসত্বে জীবনযাপন করিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শতগুণে অধিক পাপী হইয়া তোমাদের কুলে কালি দিবে!' আর বিধাতাও তাহাদের বাক্যে বলিয়াছিলেন, 'স্বস্তি'! বাস্তবিকই এই ভীষণ নিয়ম-জাল আর একটা অপকার করিয়াছে। মদ্যপান নিবারণী সভায় 'মদ্যপান করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া লোকে যদি পরে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে, তবে সে শুধু যে মদ্যপানজনিত অপরাধই করে তাহা নহে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপে তাহার চরিত্র আরও বেশি অধোগতি প্রাপ্ত

হয়। তাই ওই সকল নিয়মের ফলে আজকাল বাঙালি সমাজে ভীষণ মিথ্যাচারের প্রবর্তন হইয়াছে এবং এই মিথ্যাচারের দ্বারা কোনো জাতিই উন্নতিলাভ করিতে পারে না।

বংশপরম্পরাগত সংস্কার, যাহা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে তাহা বর্জন করিতে হইলে যথেষ্ট সাহস ও ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যক। তুমি যদি সমাজের মতে মত না দিয়া চল তাহা হইলে সমাজ তোমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিবে। মধ্যযুগে ইউরোপে যাঁহারা নূতন ধর্মপ্রচার করিতেন তাঁহাদের পোড়াইয়া মারা হইত। কোমল স্বভাবসম্পন্ন হিন্দু অবশ্য সমাজ সংস্কারককে পোড়াইয়া মারে না বটে, কিন্তু বুদ্ধির জোরে নানা কূট উপায় অবলম্বন পূর্বক তাহাকে যথেষ্ট নিগৃহীত করে। তুমি যদি সমাজের আদেশ অগ্রাহ্য কর (তা সে আদেশ যতই কেন অন্যায় হউক না) তাহা হইলে তোমায় 'একঘরে' হইতে হইবে— তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ হইবে, তোমার বাড়ি কেহ জলগ্রহণ করিবে না, তোমার কন্যা কেহ বিবাহ করিবে না ইত্যাদি। কাজেই ফল এই হইয়াছে যে আমরা আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করি না, যাহা ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই অনুকরণ করি— একবার প্রশ্ন করি না 'কেন করিতেছি?'। ইহার পর আবার গুরুবাদ আসিয়া সর্বনাশ করিল। গুরু বলিলেন, 'আমার উপর অচলা আস্থা স্থাপন কর। কোনো যুক্তিতর্ক বা প্রশ্ন করিও না। তাহা হইলেই উদ্ধার হইবে, মুক্তিলাভ করিবে।' গুরু তোমার চোখ বাঁধিয়া গলায় রজ্জু দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন, তুমি তাহাতে কোনো আপত্তি করিতে পারিবে না। একজন মানুষকে অভ্রান্ত মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা পালনে নিজের যুক্তি বিবেচনা বিসর্জন দিলে, আমাদের কার্যসমূহ যে যুক্তিহীনতার সহিত সম্পাদিত হইবে এবং তদ্দ্বারা সমাজের অবনতি সংসাধিত হইবে সে বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি আছে?

হিন্দুগণ! তোমরা যে সকল কঠোর নিয়ম পুনরায় সমাজে প্রবর্তনের অভিলাষী হইয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সে নিয়ম সকল যদি তোমাদের পূর্ব-গৌরবের দিনে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তোমাদের কীরূপ অবস্থা হইত? ভাব দেখি, যদি সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব ও তৎপুত্র

মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামীকে ধীবরকুলেই কালযাপন করিতে হইত, যদি চণ্ডালরাজ গুহকের মিত্র চণ্ডাল আলিঙ্গনকারী রঘুকুলপতি রামচন্দ্রকে জাতিচ্যুত হইয়া চণ্ডাল বংশেই বাস করিতে হইত, যদি গোপগৃহপালিত গোপান্নভোজী শ্রীকৃষ্ণকেও জাতিচ্যুত অবস্থায় থাকিতে হইত, তবে তোমরা হিন্দুধর্মের গৌরব করিতে কী লইয়া?

এককালে ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়াছিল— স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচারের দ্বারা। আবার যদি ভারতের উন্নতি হয়, তবে তাহাও স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচারের অনুষ্ঠান দ্বারাই হইবে। ভাবের দাসত্ব ও শারীরিক দাসত্ব উভয়ই জাতীয় উন্নতির সমান অন্তরায়। যাঁহারা এ দেশের মনের উপর ইংরাজি ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন বা যাঁহারা এ দেশের মনের উপর সংস্কৃত ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। হারবার্ট স্পেন্সার বা শঙ্করাচার্য উভয়েই বলিয়াছেন বলিয়াই কোনো কথা মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে। নিজের যুক্তি ও বিচারের দ্বারা উহার যথার্থ প্রমাণিত হইলেই তবে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই স্বাধীন চিন্তার মূল সূত্র। ভারতবর্ষে পুনরায় স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচার প্রবর্তিত হউক। উহা মাঝে মাঝে ডোবার পঙ্কিল দুর্গন্ধ জল অনিয়া দেয় বটে, কিন্তু মন্দাকিনীর পূত বারিধারা উহা হইতেই আসিবে— আর কিছু হইতে নহে।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথা কয়টি স্পষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। মস্তিষ্কের প্রাখর্যে বাঙালি জাতি পৃথিবীর আর কোনো জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে যে পথে এই শক্তি নিয়োজিত করিলে নানা সুফল প্রসব করিত সে পথে ইহার নিয়োগ হয় নাই, তাই জগতের সমক্ষে বাঙালি জাতির কীর্তি নিদর্শন স্বরূপ দেখাইবার অতি অল্প বিষয়ই আছে। মুসলমান শাসনকালে এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ন্যায়ের নিষ্ফল কূটতর্কে ও স্মৃতির জটিল ও স্থানে স্থানে হাস্যোদ্দীপক বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে ও প্রচলনে ব্যয়িত হইয়াছিল, সত্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত হয় নাই। আবার ইংরেজ শাসনকালে, কেরানি লেখনীচালনে এবং উকিলে অনাবশ্যক বাকবিতন্ডায় এই দুর্লভশক্তি

নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আশা করি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত বঙ্গদেশে স্বাধীন চিন্তার ও সত্যানুরাগের নির্মল স্রোত আসিয়াছে, বঙ্গীয় যুবক জাগ্রত হইতেছে। জঘন্য দাসত্বের পরিবর্তে কোনো কোনো কর্মকুশল যুবক ব্যবসা ও বাণিজ্যে ধনাগমের পথ প্রদর্শন করিবে, কল-কারখানা স্থাপন করিবে এবং কোনো কোনো তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবক ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবে। অচিরে বাঙালি জাতি জগতের উন্নত জাতিসমূহের স্থান অধিকার করিয়া বিধাতার মঙ্গলময় আদেশ প্রতিপালন করিবে।

'Indian Business' নামক পত্রিকায় সম্প্রতি যে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার চুম্বক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

'একজন পাকা ব্যবসাদারকে শিক্ষিত লোক বলিতে হইবে। সম্ভবত তিনি সাহিত্যের নামজাদা পুস্তক সম্বন্ধে বা দর্শন শাস্ত্রের কূটতর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানেন না কিন্তু তাঁহার 'সহজ বুদ্ধি' (Common sense) আছে, সেই বুদ্ধিই বাস্তবিক আসল কার্যকরী ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান। তিনি হিসাব বুঝেন। তিনি যাহাকে হিসাব বলেন তাহাই হইতেছে গণিতশাস্ত্র। তাঁহার যেটুকু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে তাহাতে দেখা যায় তিনি রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝেন। তিনি সামান্যভাবে বলেন তাঁহার পাঁচটা বিষয় জানাশুনা আছে, আমরা কিন্তু দেখি নানা লোক ও নানা বিষয় সম্বন্ধে, কৃষি, বাণিজ্য এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার কেজো ধরনের বিস্তৃত জ্ঞান আছে। তাঁহাকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার নিজের দরকারি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ গভীর, পূর্ণ এবং বিস্তৃত জ্ঞান আছে, একজন সাধারণ বি.এ বা এম.এ-র তাহা নাই। তবে প্রভেদ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ যেমন নামের পিছনে বি.এ প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ যোজনা করিয়া নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য নীরবে বিদ্যার ব্যবহার করেন। সেই জন্য লোকে অনেক ব্যবসাদারকে অশিক্ষিত বলিয়া থাকে।

'কলেজের শিক্ষাকে নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে, সওদাগর ও কারখানাওয়ালাগণ মূর্খ নহেন এবং তাঁহারা যে কেবল অদৃষ্টের জোরে বা অসদুপায়ে কৃতকার্য হইয়াছেন এ কথাও ঠিক নয়। একজন কৃতী ব্যবসাদার হইতে হইলে অনেক জ্ঞান, গভীর চিন্তা ও পরিশ্রমের আবশ্যক। আর এক কথা; যদি কাহারও পরে বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উচ্চ কলেজী শিক্ষা গ্রহণ কেবল সময়ের অপব্যবহার মাত্র। যদি জীবিকা উপার্জনের জন্যই কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে নিজের কাজের সঙ্গে যাহার সম্পর্ক নাই এমন জিনিস শিখবার প্রয়োজন নাই।

'বহুকাল হইতে লোকে বলিয়া আসিতেছে যে, কলেজি শিক্ষা পাইলে প্রণালীবদ্ধ ভাবে চিন্তা করা যায়। আমি বলি রীতিমতো ব্যবসা শিক্ষা করিলেও সেই ফল লাভ হয়, উপরন্তু ইহাতে এমন সব জিনিস শিক্ষা করা হয় যাহা প্রতিদিন কাজে লাগে। ব্যবসাদারের পক্ষে বিজ্ঞান জানা আবশ্যক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও অনেক যে সব বে-দরকারি জিনিস শেখানো হয় তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব জিনিস শেখানো হয় যাহার ফলে লোকে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতা দেখাইতে পারে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় মানবজাতির যথার্থ উপকার করিবে এবং দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিবে। আজকাল কিন্তু দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা বাহির হন তাঁহাদের মস্তিষ্ক ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের নানা বে-দরকারি বিষয়ে একেবারে বোঝাই হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিদ্যার যথেষ্ট ভড়ং থাকে বটে এবং তাঁহাদের কথাবার্তার খুব জুলুসও থাকে, কিন্তু নিজের বা পরিবারের সম্যক ভরণ পোষণে তাঁহারা একেবারেই অক্ষম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম অতি অল্পই দেখা যায়।'

উল্লেখসূত্র :

১. 'History of Hindu Chemistry', Introduction, Vol. I, 2nd Edition, Page XXIV.
২. See 'History of Hindu Chemistry', page 193.
৩. কিন্তু প্রাচীনকালের হিন্দুরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট উদারচিত্ত ছিলেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ যবনাচার্যদিগের পদতলে বসিয়া শাস্ত্রশিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বরাহমিহির বলিয়াছেন :

    'ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু শাস্ত্রমিদম্ স্থিতম্
    ঋষিবত্তেহপি পূজ্যন্তে'—

৪. R.C. Dutt's Statistics.
৫. এই প্রবন্ধটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়। তাহার পর এই ১১ বৎসর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কয়েকজন গ্র্যাজুয়েট পুরাতন মার্গ ছাড়িয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্যতা দেখাইয়াছেন। বিশেষত বর্তমান যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে একটা সুফল এই ফলিয়াছে যে বিলাতি মাল বেশি আসিতে না পারায় আমাদের দেশের কলকারখানাগুলি অধিক লাভে জিনিস বিক্রয় করিতে পারিতেছে। স্বদেশি কারখানার মধ্যে কাপড়ের কল, চর্মপরিষ্কারের কারখানা, টাটার লৌহ কারখানা, বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের মতো রাসায়নিক কারখানা প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং যে সকল জিনিস পূর্বে এদেশে প্রস্তুত হইত না তাহার মধ্যে কিছু কিছু এক্ষণে এদেশেই প্রস্তুত হইতেছে। ইহা আশা ও আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।
৬. আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। (প্রবাসী, ১৩২৪)

সম্পাদকীয় সংযোজন

পৃষ্ঠা : ১১

প্রবন্ধের সূচনাতেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মিলনীর কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯০৯ সালের ৩১ জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের রাজসাহীতে দ্বিতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন আচার্যদেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল, 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান'। তাঁর বক্তব্যের পূর্ণ বয়ানটি কুমুদিনী বসু (মিত্র) সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় মাঘ, ১৩১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা : ১২

রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্ট : এই স্বল্প আয়তন গ্রন্থে আচার্য রায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রায়শই সরব হয়েছে রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের বিরুদ্ধে। বস্তুত বাঙালির উন্নত মস্তিষ্কের অপব্যবহারের জন্য তিনি মূলত এই দুই ব্যক্তিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। প্রখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের জন্ম নবদ্বীপে, ১৬শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে। নবাব হোসেন শাহের সময়কালে রচিত 'অষ্টবিংশতিতত্ত্বস্মৃতি' গ্রন্থ তাঁকে অমর করে রেখেছে। এই গ্রন্থে তিনি আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত— এই তিন বিষয়ে হিন্দুসমাজের জন্য বহু বিধান রচনা করেছেন। আর এই সব বিধানের প্রতি অত্যধিক নীতি-নিয়মনিষ্ঠ হওয়ার ফলেই বাঙালির এই দুর্দশা বলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে বারেন্দ্রনিবাসী কুল্লুকভট্টের জন্মসময় নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। এক মতে আনুমানিক ১১শ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে, মতান্তরে ১৫শ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে। তবে তিনি যে রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী ছিলেন, সহজবোধ্য কারণেই তা মনে হয়। 'মনুসংহিতা'র সংক্ষিপ্ত টীকা 'মন্বর্থ মুক্তাবলী' তাঁর রচনা। অনেকে মনে করেন, 'স্মৃতিসাগর' নিবন্ধ গ্রন্থটিও তাঁর রচনা। বাঙালিকে

নিয়ম-নীতির কঠিন নিগড়ে বেঁধে তার মস্তিষ্ককে বিপথে চালিত করতে এঁর ভূমিকাও আচার্যের বিরক্তি উৎপাদন করেছে।

পৃষ্ঠা : ২২

বল্লালী কৌলীন্য : এই বিষয়টি সঙ্গত কারণেই প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষোভের কারণ হয়েছে। গৌড়দেশাধিপতি বল্লাল সেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৫৮-১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ। বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগিদ ও মিথিলা অর্থাৎ বাংলা ও উত্তর বিহার নিয়ে তাঁর রাজ্য গঠিত ছিল। রাজ্যশাসন অপেক্ষা সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক গ্রন্থ প্রণয়নেই তাঁর মন ছিল বেশি। আর এর ফলে সমাজে যে কৌলীন্য প্রথার যা 'বল্লালী কৌলীন্য' নামে সুপরিচিত তার প্রচলন করেছিলেন যার ফলে বাঙালির মস্তিষ্কের অপব্যবহারের পথ সুগম হয় বলে আচার্যের অভিমত। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান— এই নয়টি গুণসম্পন্ন বিদ্যাকে তিনি 'কুলীন' বলে অভিহিত করেন। সেই থেকে বংশপরম্পরায় এই আটশো-সাড়ে আটশো বছর ধরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কয়েকটি বিশেষ শ্রেণি 'কুলীন' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। যাঁদের 'সামাজিক দৌরাত্ম্য' বাঙালির মস্তিষ্কের অপব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম বলে চিহ্নিত করেছেন আচার্য রায়।

পৃষ্ঠা : ২৯

[ ] -কৃত অংশটি 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' গ্রন্থের চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং-এর তৃতীয় সংস্করণে অস্পষ্ট। এই সংস্করণের পাঠ গৃহীত হওয়ায় তা বন্ধনীকৃত ([ ]) অংশ দ্বারা চিহ্নিত করা হল।